## দ্বিতীয় অধ্যায়

# বিশ শতকের প্রথম দিকের উপন্যাসে মার্কসবাদের আভাস

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত প্রচলিত গতানুগতিক রোমান্টিক মূল্যবোধে আঘাত হেনেছিল। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের রুশ বিপ্লব বাঙালি মননে এক আবেগ তৈরি করেছিল। শুধু এলিয়টের পোড়োভূমির বাস্তবতা নয়, জীবনের সদর্থক ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির অর্থবহ বাস্তবতা নির্মিত হয়েছিল দুয়ের দশকের বাংলা সাহিত্যে। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হলে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় তা ছাপ ফেলতে থাকে। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রেও দেখি, বিগত শতাব্দীর দুই-এর দশকে প্রকাশিত হয় শরচন্দ্রের 'পথের দাবী'-র মতো সাড়া জাগানো উপন্যাস, যেখানে রামদাস তলওয়ারকার-এর মতো চরিত্রকে পাই আমরা যার কথায় উঠে এসেছে শ্রমিকশ্রেণির দুর্দশার কথা, শোষণ বঞ্চনার বিভিন্ন বিষয়। চাষাভুষো, গরিব খেতমজুর, শ্রমজীবী অংশের জাগরণ চেয়েছেন তিনি। কিন্তু সরাসরি চরিত্রটি কমিউনিস্ট নয়। এতে আভাস আছে কিন্তু স্পষ্টতা নেই। এই দশকেই মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনা অত্যাচারের বিরুদ্ধে অনেক লেখক সোচ্চার হয়েছেন। কল্লোল যুগের কারো কারো রচনায় দারিদ্র্যের কথা উঠে এসেছে কিন্তু তার ইতিবাচক উত্তরণের বিষয়গুলি আসেনি। এই সময়পর্বে কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী অংশ তাঁদের তত্ত্বচিন্তাকে প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেছেন, কমিউনিস্ট ইসতেহারের ইংরাজি অনুবাদ বাংলাদেশের শিক্ষিত তরুণ সমাজে আলোড়ন তৈরি করেছে। নজরুলের কবিতায় সংগ্রামী চেতনা, মুক্তিকামী মানুষের কথা উঠে আসছে। তাঁর গল্পে উপন্যাসেও সাম্যচিন্তা দানা বাঁধছে। তাঁরই 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে প্রথম কমিউনিস্ট নায়ককে পেলাম। সেই আভাস ইঙ্গিতগুলি আমার আলোচনায় এসেছে। এই পর্বে শুধু নজরুলের 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের আলোচনাটাই থাকছে। নজরুলের সংক্ষিপ্ত জীবন ও তাঁর অন্যান্য সাহিত্য ধারার আলোচনা সহ 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে কিভাবে মার্কসীয় চেতনা পরিগৃহীত হয়েছে তাই দেখব।

# নজরুল ইসলাম : (১৮৯৯-১৯৭৬)

## ■ মৃত্যুক্ষুধা (১৯৩০)

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪মে। আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে নজরুল ইসলাম-এর জন্ম। পিতা কাজী ফকির আহমদ-এর দুই বিবাহ। একজনের নাম জাহেদা খাতুন, অন্যজনের নাম জানা যায়নি। তবে বেশ কিছু আলোচনার ভিত্তিতে জানা যায় যে জাহেদা খাতুনের গর্ভেই নজরুলের জন্ম হয়। নজরুল জীবনীকার অরুণকুমার বসু লিখেছেন, ''ফকির আহমদের দুই পত্নীর গর্ভে মোট সাত পুত্র ও দুই কন্যার জন্ম হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র কাজী সাহেবজান। তাঁর চার পুত্রের অকাল মৃত্যু হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে নজরুলের বয়সের পার্থক্য নয় দশের বেশি ছিল না। এতগুলো মৃত্যুর ভগ্নদ্বার ঠেলে মাতৃকোলে এসেছিলেন বলেই সম্ভবত আবাল্য তাঁর ডাকনাম হয় দুখু মিঞা।''[১]

গ্রামের মক্তবেই নজরুলের প্রাথমিক পাঠ শুরু হয়। নজরুলের যখন ৯ বছর বয়স তখনই তাঁর বাবা প্রয়াত হন। নজরুলের স্মৃতিতে বা রচনায় পিতা-মাতা অনুপস্থিত। মা-র সঙ্গে সম্পর্কও খুব একটা সুগভীর ছিল না। কতকটা অভিমানেই সেই সম্পর্কের অবলুপ্তি ঘটেছিল। 'কাজী নজরুল স্মৃতিকথা' গ্রন্থের 'মায়ের প্রতি অভিমান—নজরুলের চুরুলিয়া বর্জন' অংশে মুজফ্ফর আহমদ লিখেছেন, ''কলকাতা ৩২, কলেজ স্ট্রীটে সাহিত্য সমিতির বাড়িতে দুদিন থাকার পরে নজরুল ইসলাম তাঁর জিনিসপত্র সেখানে রেখে চুরুলিয়া গ্রামে তার নিজের বাড়িতে চলে যায়। আমার যতটা মনে পড়ে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে সে সাত-আটদিন বাড়িতে ছিল। এই সময়ে তার মায়ের সঙ্গে কিসের একটা মান অভিমানের ব্যাপার ঘটে। তারপর যতদিন মা জীবিত ছিলেন ততদিন তো সে চুরুলিয়া গ্রামে যায়ই নি, মায়ের মৃত্যুর পরেও সম্বিৎ থাকা অবস্থায় সে আর কখনও চুরুলিয়া গ্রামে ফেরেনি।''[২]

নজরুল ইসলামকে ন-বছর বয়স থেকেই আপন ভাগ্য অন্বেষণে বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে হয়েছে। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দেই মক্তবে পাঠ চলাকালীন লেটোর দলে যোগদান করেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে মাথরুনে নবীনচন্দ্র বিদ্যায়তনে শিক্ষালাভের জন্য ভর্তি হন। সেখানেও বেশিদিন থাকতে পারেন নি। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে পুরোপুরিভাবে লেটোর দলে যোগদান করেন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে আসানসোল থেকে ময়মনসিংহে কিছুদিন থেকে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে আবার আসানসোল ফিরে আসেন। ১৯১৫-১৭ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত রানিগঞ্জের শিয়ারসোলের স্কুলজীবন কাটানোর পর সেখান থেকে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। শিয়ারসোলে থাকাকালীন অভিন্নহৃদয় বন্ধু শৈলজানন্দ

মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়। অন্যদিকে ওই বিদ্যালয়েরই এক শিক্ষকের জীবনাদর্শ নজরুলকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল, তিনি যুগান্তর দলের কর্মী নিবারণচন্দ্র ঘটক। অরুণকুমার বসু জানাচ্ছেন, ''নিবারণচন্দ্র ঘটকের দ্বারা নজরুল গভীরভাবেই প্রভাবিত হয়েছিলেন।''[৩] স্বদেশপ্রেম ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মানসিকতা গঠনে মাস্টারমশাই নিবারণচন্দ্রের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন নজরুল। ওই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে নজরুল এক বড় বাহিনীর সঙ্গে লাহোর যাত্রা করেন। ৪৯ নম্বর বাঙালি রেজিমেন্টের অন্যতম হাবিলদার পদে নজরুল নিযুক্ত হন। সাহিত্য, রাজনীতিচর্চা, দেশপ্রেম তাঁর মানসিকতায় গাঢ় হয়ে বসে। ''একাধিক বাদ্যযন্ত্র শেখা, ছাউনির জনৈক পাঞ্জাবি মৌলবীর কাছে আরবি ফারসি তালিম নেওয়া, স্বরলিপি দেখে রবীন্দ্রসঙ্গীত তোলা, বিপ্লবী পত্রপত্রিকা গোপনে পড়া, বেশ কয়েকটি বাংলা পত্রপত্রিকা চাঁদা দিয়ে গ্রাহক হয়ে নিয়ম করে আনানো ও পড়া—এ সবেই তাঁর ছাউনির দিনগুলি ছিল নিশ্ছিদ্র—নিবিড় উচ্চকণ্ঠ রসিকতায় যেমন সবাইকে মাতিয়ে রাখতেন তেমনই গোপনে সই সংগ্রহ করতেন রাজদ্রোহমূলক কাগজপত্র, আনাতেন নিষিদ্ধ পত্রিকা, সংবাদ রাখতেন আইরিশ বিপ্লব, রুশ বিপ্লবের।''[৪] অর্থাৎ দেশপ্রেম, আন্তর্জাতিকতা, শিল্পসাহিত্যে অনুরাগ এই সময় থেকেই নজরুলের মধ্যে প্রবলভাবে গড়ে উঠতে থাকে। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ৪৯ নম্বর বেঙ্গলি রেজিমেন্ট ভেঙে গেলে কাজী নজরুল ইসলাম কলকাতায় চলে আসেন। ৩২, কলেজ স্ট্রিটের বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে মিলিত হন মুজফ্‌ফর আহমদ-এর সঙ্গে। ঐ অফিসেই দুজনে একত্রে বসবাস শুরু করলেন। পরবর্তীকালে তাঁদের দুজনের যৌথ উদ্যোগে বাংলা সাহিত্য ও রাজনীতি অনেকখানি উপকৃত হয়েছিল।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর বিপ্লব অর্থাৎ বলশেভিক বিপ্লবের জয়, সমগ্র পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষের মধ্যে উন্মাদনা তৈরি করেছিল, বিশেষ করে উপনিবেশিক শাসনাধীনে থাকা মানুষদের মধ্যে। ব্রিটিশ সরকার সজাগ ছিল যাতে তাদের উপনিবেশগুলি সহ ভারতে যেন ওই বিপ্লবের আঁচ না এসে লাগে। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে তো নয়ই। কিন্তু ''সেনা ব্যারাকে অবস্থানকালে নজরুল নানা পথে বলশেভিক বিপ্লব সম্পর্কে বিভিন্ন খবর সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন।''[৫] পরবর্তীকালে ওই বিপ্লবের আবেশ মনের মধ্যে সযত্নে গেঁথেছিলেন। সোভিয়েত বিপ্লব, লালফৌজের প্রতি অনুরাগ নজরুলের দুটি গল্পে ফুটে উঠেছে। সেগুলি হল—'হেনা' (১৩২৬ ব., বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা; কার্তিক সংখ্যা) ও 'ব্যথার দান' (ঐ পত্রিকার মাঘ সংখ্যা)। ইংরেজের হয়ে যুদ্ধ করা নায়ক কীভাবে তার রাইফেলের অভিমুখকে ইংরেজের দিকে ঘুরিয়ে দেয় তারই কাহিনি লিপিবদ্ধ হয়েছে 'হেনা' গল্পে।

অন্যদিকে 'ব্যথার দান' গল্পে ব্যবহৃত লালফৌজের উল্লেখ (যদিও নজরুলের ব্যবহৃত 'লালফৌজ' শব্দটি মুজফ্‌ফর আহমদ কেটে দিয়ে 'মুক্তি সেবক সেনাদের দল' লিখেছিলেন রাজরোষ থেকে নজরুলকে মুক্ত রাখার জন্য। গল্পদুটির মধ্য দিয়ে ইংরেজ-বিদ্বেষ মানসিকতা তার সঙ্গে সোভিয়েতের লালফৌজের প্রতি অনুরাগ ফুটে ওঠে। 'ব্যথার দান' গল্পে ব্যবহৃত 'লালফৌজ', 'লাল নিশান' প্রভৃতি শব্দবন্ধ যে নজরুলের সাম্যবাদী চেতনার প্রতি অনুরাগের ফল তা মুজফ্‌ফর আহমদ বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং ওই শব্দগুলি যে নেহাত কল্পনাপ্রসূত ছিল না তাও তিনি বলেছেন, ''নজরুল ইসলামের গল্পের নায়করা যে লালফৌজে যোগ দিল তা নিছক কল্পনার বিলাস ছিল না, ওরকম বাস্তব অবস্থা সে সময় ঘটছিল বলেই সে তার নায়কদের লালফৌজে যোগ দেওয়ার কথা লিখতে পেরেছিল।"[৬]

১৯২০ খ্রিস্টাব্দে পর থেকেই নজরুলের কার্যত কলকাতার কর্মজীবন। মুজফ্‌ফর আহমদ-এর সান্নিধ্যে সেই কর্মজীবন আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। মুজফ্‌ফর আহমদ অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম একজন ছিলেন। মার্কসীয় তত্ত্বদর্শন বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট বুৎপত্তি ছিল। এম.এন. রায়, মুজফ্‌ফর আহমদ-এর মাধ্যমে নজরুলকে ইউরোপে পাঠানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, ''যদিও নজরুল রাজি ছিলেন না।"[৭] নজরুল ইসলাম কোনোদিন কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেননি। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ছিল। মুজফ্‌ফর আহমদ-এর কথায় তার আভাস মেলে। ''১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে নজরুল ও আমি ঠিক করি যে আমরা কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার কাজে এগিয়ে যাব। পড়াশুনা করব বলে সামান্য কিছু পুঁথি পুস্তকও কিনেছিলাম।"[৮]

এছাড়াও নজরুলের কমিউনিজম প্রীতি উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি আরও বলেছেন, ''নজরুলের লাল নিশান সত্য সত্য লালদেরই নিশান। শুধু 'ব্যথার দান' গল্পে নয়, তার রচনায় যেখানেই 'লাল নিশান' কথার উল্লেখ করেছে, সেখানেই সে লালদের লাল নিশানকেই মনে করেছে। জীবনের পথে অনেক বিচ্যুতি তার ঘটেছে একথা সত্য, কিন্তু লাল কখনও তার নিকটে কালো হয়নি।"[৯]

১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুলাই আত্মপ্রকাশ ঘটে সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ'-এর। মুজফ্‌ফর আহমদ ও নজরুল ইসলামের যৌথ সম্পাদনায়, পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন কংগ্রেস ও খিলাফৎ আন্দোলনের অগ্রগণ্য নেতা কে. ফজলুল হক। কৃষক ও শ্রমিকদের কথা এই পত্রিকায় গুরুত্বের সঙ্গে ছাপা হতো। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মানসিকতা তুলে ধরতো ওই পত্রিকা। পত্রিকাটির উপজীব্য ছিল অত্যন্ত ঝাঁঝালো। নজরুলের সাংবাদিকতার গুণে পত্রিকাটি রাজরোষে পড়ে। 'মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?' (মুহাজির কথার অর্থ নির্বাসিত, মুহাজিরিন শব্দটি মুহাজির

শব্দের বহুবচন), 'ধর্মঘট' প্রভৃতি নজরুলের রাজনীতির গন্ধ ঘেঁষা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। মুজফ্‌ফর আহমদ জানাচ্ছেন—'' 'নবযুগ'-এর গরম লেখার জন্য পরপর দু-বার বা তিনবার সরকার আমাদের সতর্ক করেছিল। শেষ সতর্ক করেছিল 'মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?' শীর্ষক প্রবন্ধের জন্য। প্রবন্ধটি নজরুল ইসলামের লেখা। এই লেখাটিই ভারতের ব্রিটিশ শাসকের পক্ষে অসহ্যবোধ হয়েছিল।''[১১]

এই সময়পর্বেই দেশের সর্বত্র সরকারবিরোধী আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। আর তারই সমর্থনে স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত, কলকারখানায় ধর্মঘট শুরু হয়। আর তার প্রতি সংহতি জানিয়েই 'নবযুগ'-এ প্রকাশিত হয় নজরুলের 'ধর্মঘট' শীর্ষক প্রবন্ধটি। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাস থেকে 'নবযুগ' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

১৯২২-এর ১২ অগস্ট নজরুলের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'ধূমকেতু' এটি ছিল অর্ধসাপ্তাহিক পত্রিকা অর্থাৎ সপ্তাহে দু-বার প্রকাশিত হতো। 'ধূমকেতু'তে 'সম্পাদক'-এর পরিবর্তে 'সারথি' অভিধাটি ব্যবহার করতেন নজরুল। এই পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই নজরুল পূর্ণ স্বরাজের দাবিকে জোরদার করেন। তিনি অহিংস পথকে পরিহার করে সন্ত্রাসবাদী পথে যুবসমাজকে আহ্বান জানান। মুজফ্‌ফর আহমদ লিখছেন—

> ১৯২৩-২৪ সালে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন যে মাথা তুলল, তাতে নজরুলের অবদান ছিল, একথা বললে বোধহয় অন্যায় হবে না। সন্ত্রাসবাদী-বিপ্লবীদের দুটি বড় বিভাগের মধ্যে 'যুগান্তর' বিভাগের সভ্যরা তো বলেছিলেন, 'ধূমকেতু' তাঁদেরই কাগজ।[১২]

নজরুলের ক্ষুরধার ও জোরালো লেখা কীভাবে তৎকালীন 'রাজনীতি'কে প্রভাবিত করেছিল তার দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। 'ধূমকেতু'-র ১১তম সংখ্যা ১৭ই কার্তিক ১৩২৯ বঙ্গাব্দের সম্পাদকীয় নিবন্ধ 'নিশান বরদার'—''ওঠ ওগো আমার নির্জীব ঘুমন্ত পতাকাবাহী বীর সৈনিক দল। ওঠ, তোমাদের ডাক পড়েছে—রণ দুন্দুভি রণ-ভেরী বেজে উঠেছে। তোমার বিজয় নিশান তুলে ধর। উড়িয়ে দাও উঁচু করে, তুলে দাও যাতে সে নিশান আকাশ ভেদ করে ওঠে। পুড়িয়ে ফেল ঐ প্রাসাদের উপর যে নিশান বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে তোমাদের উপর প্রভুত্ব ঘোষণা করছে।... তোমাদের বিজয়পতাকা তুলে ধর সৈনিক। পতাকার রং হবে লাল, তাকে রং করতে হবে খুন দিয়ে।''[১৩]

সুস্নাত দাশ লিখেছেন, ''নবযুগ পত্রিকায় যদি শ্রমজীবী মানুষকে জাগিয়ে তোলার কথা লেখেন, তবে 'ধূমকেতু'র পাতায় নজরুল খুঁজলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে। তাদের জাগাতে চাইলেন এই পত্রিকার মাধ্যমে। পাশে পেলেন মুজফ্‌ফর আহমদ ছাড়াও ভূপতি মজুমদার, বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধ রায়, মঈনুদ্দিন হোসেন, নলিনীকান্ত সরকার প্রমুখকে।''[১৪]

> নজরুলের 'নবযুগ'-ই ছিল বাংলা ভাষায় শ্রমিক ও কৃষকদের সমস্যা বিষয়ক প্রথম পত্রিকা। মজুর আন্দোলনের সমস্ত খবরাখবর প্রথম এখানেই প্রকাশিত হতো। এই পত্রিকায় প্রকাশ্যেই রুশবিপ্লব অভিনন্দিত হয়। ধর্মঘটে শ্রমিক আন্দোলনে নজরুলের সমর্থন ও সহানুভূতি স্পষ্টতই ছিল আন্দোলনের পক্ষে। 'নবযুগ'-এর মাধ্যমে এ দেশে প্রথম সাম্যবাদী চিন্তার প্রকাশ ও চর্চার পথিকৃৎ হয়ে উঠেছিলেন নজরুল।[১৫]

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ১ নভেম্বর বাংলাদেশে 'ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজান্টস্ পার্টি' গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার সময় এই সংগঠনটির নাম ছিল 'লেবার স্বরাজ পার্টি অব দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস'। হেমন্তকুমার সরকার, কুতুবউদ্দিন আহ্মদ, শামসুদ্দিন হুসেন প্রমুখদের মতোই নজরুল ছিলেন প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। পরবর্তীকালে 'কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত মুজফ্ফর আমহদ জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এই সংগঠনে যোগ দেন। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ যোগ দেন সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রখ্যাত সাহিত্যিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, হেমন্তকুমার সরকার প্রমুখ। এই লেবার স্বরাজ পার্টির মুখপত্র হিসেবে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর আত্মপ্রকাশ করল 'লাঙল'। এটি ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা। এই পত্রিকার প্রধান পরিচালক ছিলেন নজরুল ইসলাম। লেবার স্বরাজ পার্টির যে রাজনৈতিক ইস্তাহার, যেখানে উল্লিখিত হয়েছিল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্যের কথা, তা 'লাঙল'-এই প্রকাশিত হয়। সংবিধান, নীতি, কর্মসূচি ইত্যাদি 'লাঙল'-এ প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যাতেই ছাপা হয় নজরুলের 'সাম্যবাদী' কবিতা। দ্বিতীয় সংখ্যাতে প্রকাশিত হয় নজরুলের 'কৃষাণের গান'।

> এই (লেবার স্বরাজ পার্টি) রাজনৈতিক পার্টিকে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রাথমিক রূপ বলে গণ্য করা হয়। নজরুলের রাজনৈতিক চেতনা কতটা পরিণত ও বস্তুবাদ সম্মত তার পরিচয় পাওয়া যায়, দলের ইস্তাহার রচনায়। শ্রমজীবী মানুষের গুরুত্ব ও স্বার্থ সংরক্ষণের প্রতি সতর্ক মনোযোগ ঐতিহাসিক কমিউনিস্ট ইস্তাহারের সঙ্গে আত্মিক পরিণতি বলেই বিশ্বাস হয়। এই দলের সদস্যপদ সম্পর্কে নজরুল লিখলেন—''ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির যে-কোনো সভ্য এই দলের উদ্দেশ্য, গঠন প্রণালী এবং কার্যপদ্ধতি অনুমোদন করেন তিনিই। কেন্দ্রীয় সমিতির মত হইলে, শ্রমিক-প্রজা স্বরাজ সম্প্রদায়ের সভ্য হইতে পারিবেন। যতদিন শ্রমিক ও চাষীর কার্যপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত থাকিবে ততদিন এই দলের সভ্যগণের স্বরাজ দলের সভ্য হওয়ার বাধা নেই।
>
> কর্মনীতি এবং সংকল্প অংশে উল্লিখিত হয়েছে—''এই দল শ্রমিক এবং কৃষকগণের স্বার্থের জন্য যুঝিবেন।''[১৬]

এই শ্রমিক কৃষক সহ অপেক্ষাকৃত অনুন্নত মানুষের প্রতি ভালোবাসা, পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তির প্রয়াস সর্বোপরি সাম্যবাদে আস্থা, বিশ্বাস-এর প্রতিফলন তাঁর মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসে দানা বেঁধেছে বলেই মনে করি।

■ **মৃত্যুক্ষুধা**

একটি মুসলমান পরিবার, মূলত অভিভাবকহীন। গজালের মা-র তিন ছেলেই মৃত। রেখে গেছে তিন বৌ আর বারোটি সন্তান। ছোটো ছেলে প্যাঁকালে, আসল নাম করিম—মজুর খাটে রাজমিস্ত্রির কাজে। সারাদিন পরিশ্রম করে ভাইপো ভাইঝিদের মুখে দু-বেলা দু-মুঠো ভাত তুলে দেওয়ার চেষ্টায়। তার বোন আর বৌদিরাও ধান ভানে, চিড়ে কোটে, কাঠ কুড়ায়, সুতো কাটে—পেট ভরে না তবুও। মনের কোণে প্যাকালে লালন করে প্রতিবেশিনী কুর্শির প্রতি প্রেম। মেয়েটার বাপ আগে মুসলমান ছিল এখন খ্রিস্টান হয়েছে। ওই বাড়িরই মেজবৌ একটি ব্যতিক্রমী চরিত্র। নীরবে সে সেবা করে চলে সকলের। বড়লোক ভগ্নিপতি তাকে নিকে করতে চাইলে সেই প্রস্তাব সে হেলায় ফিরিয়ে দেয়। দারিদ্র্য তার মুখের হাসিকে কেড়ে নেয়নি। কণ্ঠভরে তার গান আসে, সে সুন্দরী, রহস্যময়ী। গজালের বোন পাঁচি এই সংসারে আসে সন্তান হতে। দারিদ্র্যের সংসারে স্বাভাবিক চাপ সবাই অস্বাভাবিকতায় মেনে নেয়। বাড়ির সেজ বৌও অসুস্থ দীর্ঘদিন, তাকে ঔষধ, পথ্য ঠিকমতো তারা দিতে পারে না। এই দারিদ্র্যের ছিদ্রপথে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় পাদ্রিরা। সেজবৌ আর বাঁচে না শেষ পর্যন্ত। বাড়ির বাচ্চাগুলো একটু খাবার পায়, বিস্কুট পায়। নানান ঘাত প্রতিঘাত, ক্ষুধা, মৃত্যু, অনাহার মেজবৌকে এক প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়। আল্লায় অবিশ্বাস নিয়ে সে খ্রিস্টান দিদিমণির কাছে চলে যায়। লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। আর এরূপ সিদ্ধান্তে সে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। তার ছেলেমেয়ের সঙ্গেও সম্পর্ক ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়। অবশেষে সে খ্রিস্টান হয়ে যায়। নাম হয় হেলেন। মুসলমান সমাজে তার নিজের কোনো নাম ছিল না। অনেকগুলি সেবিকাকে মিশনারিরা নিয়ে গেলেন বরিশালে। কৃষ্ণনগর ছেড়ে পেটের ছেলেমেয়ে ফেলে চলে গেল মেজবৌ। পরে খোকার মৃত্যুর পর আবার মেজবৌ ফিরে আসে নিজের সংসারে।

এই কাহিনিতেই আনসার নামে এক দেশপ্রেমিক, সমাজসেবী বিপ্লবীর প্রবেশ ঘটেছে। শ্রমজীবী জনঅংশের সঙ্গে তার যোগাযোগ উপন্যাসে দেখিয়েছেন লেখক, কিন্তু মেজবৌ ও রুবির সঙ্গে তার কোমল সম্পর্কের বিষয়টিকে বেশি করে এনেছেন। পরিণতিতে আনসারের মৃত্যু ঘটেছে যক্ষায়, ওয়ালটেয়ারে।

কৃষ্ণনগরে অবস্থানকালেই 'আত্মশক্তি' পত্রিকার সম্পাদক গোপাললাল সান্যালকে একটি চিঠিতে নজরুল ইসলাম লিখছেন—

> কার্ল মার্কসের মতবাদ সাধারণ শ্রমিক বুঝতে না পারলেও তা দিয়ে তাদের মঙ্গল সাধিত হয়েছে, হচ্ছে, হবে। এ মতবাদ দিয়ে এমন কতকগুলি লোকের সৃষ্টি

> হয়েছে, যারা জগৎটাকে উল্টে দিয়ে নতুন করে গড়তে চাইছেন বা গড়ছেন। মতবাদ কোনো কালেই জনসাধারণ বুঝবে না, মতবাদ তৈরি করে তুলবে সেই রকম লোক যারা বুঝাবেন এ মতবাদের মর্ম্ম জনসাধারণকে। ইঞ্জিন চালাবে ড্রাইভার কিন্তু গাড়িতে চড়বেন জনসাধারণ।[১৭]

'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে নজরুল এ-রকমই এক মতাদর্শের বাহককে চিহ্নিত করেছেন। আনসার। একজন কমিউনিস্ট চরিত্র। অভ্যন্তরীণ বিচারে হয়তো নয়, কিন্তু বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিকাশপর্বের শুরুর দিকে কোনো উপন্যাসে প্রথম সরাসরি উল্লিখিত কমিউনিস্ট চরিত্র। 'বাংলা উপন্যাসে কমিউনিস্ট চরিত্র' প্রবন্ধে বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য কমিউনিস্ট চরিত্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, ''কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য অথবা কমিউনিস্ট মতাদর্শের অনুরাগী চরিত্র হয়তো আক্ষরিক অর্থেই কমিউনিস্ট চরিত্র।''[১৮]

সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকা মানুষের সমষ্টিচেতনায় উদ্বুদ্ধ অবিচ্ছিন্ন, অখণ্ডিত মানুষ-এর মধ্যে কমিউনিজম্-এর লক্ষণকে দেখেছেন। অর্থাৎ যাঁরা ব্যক্তিসত্তাকে অক্ষুণ্ণ রেখেও সমাজিক সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়।

নজরুল ইসলাম সেভাবে 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' বা 'দাস ক্যাপিটাল' গ্রন্থের পাঠ নেননি। রুশ বিপ্লবের অনুপ্রেরণা, কিছু রুশ পত্রপত্রিকা পাঠ, সর্বোপরি চোখের সামনে কিছু কমিউনিস্ট চরিত্রকে বন্ধু-স্বজন হিসাবে পেয়েছিলেন। আর এটুকু সম্বল করে একজন যথার্থ কমিউনিস্ট চরিত্র আঁকা সম্ভব ছিল না। কিন্তু 'আনসার'কে তাঁর ধারণা অনুযায়ীই রূপায়িত করেছিলেন।

কৃষ্ণনগরে মাসতুতো বোন লতিফা (বুঁচি)র কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছে আনসার। পিছনে রয়েছে পুলিশের চর। রুবিকে সে ভালোবাসে এখনো। বিয়ে হয়নি তাদের। রুবি বিধবা। আনসারের প্রতি পূর্ব টানবশত এখনো রুবি আকর্ষিত। কৃষ্ণনগরে আসার উদ্দেশ্যও উপন্যাসে বিবৃত—''এখানে একটা শ্রমিক সংঘ গড়ে তুলতে এসেছি। প্রতি জেলায় আমাদের শ্রমিক সংঘের একটি করে শাখা থাকবে। আপাতত সেই মতবলেই ঘুরে বেড়াচ্ছি সব জায়গায়। ''[১৯]

'কাজী নজরুল ইসলাম, বিপ্লববাদ থেকে সাম্যবাদ' প্রবন্ধে কল্পতরু সেনগুপ্ত লিখছেন—

> অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে নজরুলের বিশেষ ভূমিকা ছিল। কংগ্রেসের মধ্যে শ্রমিক কৃষক দল গঠনের এবং পরবর্তীকালে শ্রমিক কৃষক পার্টি গঠনে তাঁর ভূমিকা ছিল। শ্রমিক কৃষক পার্টির যে গঠনতন্ত্র কর্মসূচি মুদ্রিত ও প্রচার হয়েছিল, তাতে প্রকাশক হিসাবে নজরুলের নাম ছিল।... শ্রমিক কৃষক পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রাথমিক পর্যায়। এই পর্যায়ে তিনি বাউরিয়া চটকলে, খিদিরপুরে জাহাজীদের মধ্যে উপস্থিত হয়ে তাঁদের গান শোনাতেন এবং কবিতা

> আবৃত্তি করতেন। ইউনিয়ন গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে নজরুলের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।[২০]

'বাংলা উপন্যাসে কাজী নজরুল ইসলাম' প্রবন্ধে সুমিতা চক্রবর্তী লিখেছেন—''আত্মজীবনের বহির্ঘটনাই এই উপন্যাসের (মৃত্যুক্ষুধা) উপাদান, মনের অন্তঃরূপ এখানে প্রাধান্য পেয়েছে বিচিত্রভাবে।''[২১] লেখিকার উদ্ধৃতি ও কল্পতরু সেনগুপ্তর তথ্য অনুযায়ী বলা যেতেই পারে নজরুলের শ্রমিক সাধারণের স্বার্থে যে লড়াই আন্দোলন তার প্রকাশ ঘটেছে আনসারের কাজকর্মে।

কৃষ্ণনগরে আনসারের কর্মসূচি উপন্যাসে উল্লেখ আছে—

> দু তিন দিনেই আনসার গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান, ঘোড়ার গাড়ীর কোচোয়ান, রাজমিস্ত্রী, কুলি মজুর মেথর প্রভৃতিদের নিয়ে শহরে একটা রীতিমত হুলস্থূল বাধিয়ে তুলেছে। শহরময় গুজব রটে গেছে যে, রুশিয়ার বলশেভিকদের গুপ্তচর এসেছে লোক ক্ষ্যাপাতে। সরকারী কর্তাদের মধ্যেও এ নিয়ে কানাঘুষা চলছে। ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ, মিউনিসিপ্যালিটি, এমনকি কংগ্রেসওয়ালারা পর্যন্ত আনসারকে কেমন বাঁকা চোখ, বাঁকা মন নিয়ে দেখতে শুরু করেছে। আনসারের ভ্রূক্ষেপই নাই।[২২]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে লেবার স্বরাজ পার্টির সঙ্গে নজরুল ইসলামের যোগাযোগের কথা। মূলত কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্নদেরই যোগাযোগ ছিল ওই পার্টিতে। ''১৯২৬ সালে কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত নিখিলবঙ্গীয় সম্মিলনীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনকে সফল করতে নজরুল উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। ওই সম্মেলন উপলক্ষেই নজরুল 'কৃষাণের গান' কবিতাদুটি লিখেছিলেন।''[২৩]

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ১১-১২ মার্চ ফরিদপুরে নিখিলবঙ্গীয় ও আসাম প্রদেশীয় মৎস্যজীবী সম্মিলনীর তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলে হেমন্ত সরকার, সৌম্য ঠাকুর প্রমুখের সঙ্গে নজরুলও ওই সম্মেলনে যোগ দেন। ওই সম্মেলন উপলক্ষেই নজরুল রচনা করেন 'ধীবরের গান'। ''১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ১৯-২০ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে 'পেজ্যান্টস্ অ্যান্ড ওয়ার্কার্স পার্টি অব বেঙ্গল'-এর দ্বিতীয় সম্মেলনের কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন নজরুল।''[২৪]

মৎস্যজীবী, কৃষক, শ্রমিক জনঅংশের সঙ্গে নজরুলের যোগাযোগ আনসারের কাজকর্মের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আনসার নিজের রাজনৈতিক রূপান্তরের কথা বলতে গিয়ে বুঁচিকে জানিয়েছে—''আমি এখানে কেন এসেছি জানিস? জেল থেকে ফিরে এসে অবধি আমার রাজনৈতিক মত বদল হয়ে গেছে। আমি এখন...''[২৫] এখানে একটি বিষয় সুস্পষ্ট। 'আমি এখানে কেন এসেছি' অর্থাৎ আনসারের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে শ্রমিক সংঘ গঠন তো আগেই আলোচিত হয়েছে। রাজনৈতিক মত বদল করে সে কমিউনিজম-এ

আকৃষ্ট। আমরা আগেই আলোচনা করেছি জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ১৯২০ সালের পর অথবা মিরাট ষড়যন্ত্র মামলার বিচারাধীন কমিউনিস্ট বন্দিদের কাছে মার্কসীয় তত্ত্বের পাঠ নিয়ে অনেক কংগ্রেসি কমিউনিজম-এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে চলে আসেন। তাঁদের পরিচয় নজরুলের অজানা ছিল না। আনসারও তাই সেরকমভাবেই কমিউনিস্ট হিসাবে পার্টিতে যোগ দিয়েছে এবং বলেছে ''সুতোয় কাপড় হয়, দেশ স্বাধীন হয় না।''[২৬]

আনসারের মনোজগতে মতাদর্শের সংগ্রামকে নজরুল গেঁথে দিয়েছেন—''আনসার জানে শুধু কার্ল মার্কস, লেনিন, ট্রটস্‌কি, স্টালিন, কৃষক, শ্রমিক পরাধীনতা অর্থনীতি।''[২৭] 'পীড়িত মানবাত্মার জন্য বেদনাবোধ' অনুভবে তাড়িত আনসার। 'রুশিয়ার বলশেভিক চর ও বিপ্লবী নেতা, সে ছেলেদের মধ্যে কম্যুনিস্ট মতবাদ প্রচার করছিল'—এই অপরাধে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে।[২৮] আনসারের এই গ্রেপ্তারের সংবাদ বিদ্যুৎগতিতে শহরময় ছড়িয়ে পড়ে। ''দলে দলে মেথর কুলি, গাড়োয়ান-কোচোয়ান, কৃষক-শ্রমিকেরা নাজির সায়েবের বাড়ির দিকে ছুটতে লাগল। পুলিশের মার গুঁতো চাবুক-লাথিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তারা নাজির সায়েবের ঘর ঘিরে ফেললে। পুলিশ উপায়ান্তর না দেখে দু-একটা ফাঁকা আওয়াজও করল বন্দুকের, কেউ একপাও পিছুল না। ওরি মধ্যে একটা বৃদ্ধ মেথর চীৎকার করে বলে উঠল, 'হুজুর, আমাদের বাবাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছ, ওর চেয়ে মার আর কি আছে? আমাদের বুকে বরং গুলি মার, আমাদের বাবাকে ছেড়ে দিয়ে যাও।''[২৯] এই জনঅংশের মধ্যে নিজের প্রতিষ্ঠাকে সুনিশ্চিত করেছিল আনসার। জনগণই জননেতা নির্মাণ করে, ব্যক্তিগত সব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে সমষ্টির চিন্তাকে প্রসারিত করেছিল আনসার, না হলে তার জন্য জনআত্মা কাঁদবে কেন?

আনসারও কারান্তরালে যাবার পূর্বে তার প্রিয় শ্রমিক-মজুর দলকে উদ্দীপিত করে বলেছে—

> যে বিপুল প্রাণশক্তি নিয়ে সৈনিকেরা যুদ্ধ করে, সেই প্রাণশক্তির অভাব যদি না হয় তোমাদের, তোমরা জয়ী হবেই।... কোচোয়ান! তোমার হাতে চাবুক আছে বুনো ঘোড়াকে তুমি চাবুক মেরে শায়েস্তা কর, আর মানুষকে শায়েস্তা করতে পারবে না? রাজমিস্ত্রী! তোর হাতের কন্নিক দিয়ে ফুটগজ দিয়ে এত বাড়ি ইমারত তৈরি করতে পারলে, বুনো প্রকৃতিকে রাজলক্ষ্মীর সাজে সাজালে পীড়িত মানুষের নিশ্চিন্তে বাস করার স্বর্গ তোমরাই রচে তুলতে পারবে। আমার ঝাড়ুদার মেথর ভাইরা! তোমরাই তো নিজেদের অশুচি অস্পৃশ্য করে পৃথিবীর শুচিতা রক্ষা করছ। নিজে সমস্ত দূষিত বাষ্প গ্রহণ করে আয়ুক্ষয় করে আমাদের পরমায়ু বাড়িয়ে দিয়েছ, আমাদের চারপাশের বাতাসকে নিষ্কলুষ করে রেখেছ। এত ময়লাই যদি পরিষ্কার করতে পারলে, তাহলে এই ময়লা মনের ময়লা মানুষগুলোকে কি শুচি করতে পারবে না? তোমাদের মত ত্যাগী করতে পারবে না? তোমাদের ঐ ঝাড়ু দিয়ে তাদের বিষ ময়লা ঝেড়ে ফেলতে পারবে না?[৩০]

এই যে অসংগঠিত ক্ষুদ্র পরিবহন কর্মী, নির্মাণকর্মী, সাফাই কর্মী প্রমুখরা যে সভ্যতার পিলসুজ, সেই অংশকে নেতা হিসাবে আনসার উদ্দীপিত করছে। তাদের সংগঠিত রূপকে দেখতে চাইছে, সব রকমের শোষণ শাসনের অবসান চাইছে ঐ জনঅংশের সংগঠিত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। আনসার সংগঠিত জনতার উদ্দেশে বলেছে—''তোমরা মনে রেখো, তোমরা আমার উদ্ধারের জন্য এখানে আসনি, তোমাদের সে মন্ত্র আমি কোনদিনই শিখাইনি, তোমরা তোমাদের উদ্ধার কর—সেই হবে আমার বড় উদ্ধার।''[৩১] নজরুল কমিউনিস্ট গঠনতন্ত্র বিষয়ে সচেতন, একথা বলতে পারব না, কিন্তু একজন কমিউনিস্ট নেতা কেমন হওয়া উচিত এ-বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। তাই তো আনসার নিজেকে সমষ্টির অংশ হিসাবেই ভাবতে পেরেছে। সমষ্টিকে গুরুত্ব দিয়েছে, আত্মস্বার্থ অপেক্ষা সমষ্টি স্বার্থকে বড় করে দেখেছে। বাংলা উপন্যাসে এরূপ কমিউনিস্ট চরিত্র এই প্রথম, যথার্থ না-ই হোক।

নজরুল ইসলাম আনসারকে যথার্থ কমিউনিস্ট করে তুলতে পারলেন না। পরিণতিতে 'জনতার আমি' হয়ে উঠতে পারল না আনসার। রোমান্টিক নায়কের শেষ পরিণাম যেমন হয় তেমনই পরিণতি ঘটেছে আনসারের। চরিত্রটা সামগ্রিক হয়ে উঠতে পারতো কিন্তু হয়নি। অনেকটা খাপছাড়া গোছের মনে হয়েছে। উন্মত্ত জনতাকে আনসার বলেছে—''তোমরা ফিরে যাও। ভয় নেই, আমার ফাঁসি হবে না। আবার আমি ফিরে আসব তোমাদের মাঝে।''[৩২] আবার স্নেহের বুঁচিকে সে লিখছে—''আমি ঠিক করেছি ছাড়া পেলেই সোজা ওয়ালটেয়ারে ছুটে যাব। আমি চাই এই বন্ধনের পর নিঃসীম মুক্তি। মাথায় অনাবৃত আকাশ, চোখের সামনে কুলহারা, তটহারা জলধি, মনের সামনে নিরবচ্ছিন্ন একা—একা আমি।''[৩৩] অর্থাৎ কথা রাখতে পারল না আনসার—'জনতা' থেকে 'একা'। আত্মমগ্ন পরিণতি চাইছে জনতার নায়ক? এ আর যাই হোক, যথার্থ কমিউনিস্টের চাওয়া নয়। রুবিও ওয়ালটেয়ারে আনসারের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তাকে সঙ্গ, সেবা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি। রুবি একটি চিঠিতে বুঁচিকে জানাচ্ছে—''তোদের সকলের জন্য সে কেঁদেছে। কতবড়, কত বিপুল জীবন নিয়ে সে জন্মেছিল—আর কি দুঃখ নিয়েই না গেল? রাজার যে ঐশ্বর্য নিয়ে যে এসেছিল, সে গেল ভিখারীর মত,—নিরন্ন, নিঃসহায়, নির্বন্ধু—একা।'' কেন এই বিচ্ছিন্নতা? মতাদর্শের সংকট ঘটলে সমষ্টির নায়কের এমনতর বিচ্ছিন্নতা ঘটে।

'বিপ্লববাদ থেকে সাম্যবাদ' প্রবন্ধের কল্পতরু সেনগুপ্ত লিখেছেন—''মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলার সূচনাকাল পর্যন্ত নজরুল ইসলামের চিন্তায় চেতনায় সাম্যবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা চলাকালীন সময়ে তিনি সঙ্গীত জগতে আত্মনিমজ্জিত হয়ে রাজনৈতিক চিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান।''[৩৫] এরূপ ঘটনার প্রভাব 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে

নায়ক আনসারের উপর পড়েছে বলেই মনে হয়।

কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন যখন অঙ্কুরিত হচ্ছে সেই সময়কার ফসল 'মৃত্যুক্ষুধা'। কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের সামগ্রিক জ্ঞান লাভ করে তাকে শিল্পরূপ দেওয়ার বিষয়টি উপন্যাসিকরা সে-সময় ভাবেননি। নজরুল ভেবেছেন, ব্যাকরণগত ভুল থাকতে পারে, কিন্তু শ্রেণিহীন, শোষণহীন সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখিয়েছেন, আনসারের চোখ দিয়ে।

'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের এক উজ্জ্বল চরিত্র মেজবৌ। সমাজ, ধর্ম, পরিবারের বঙ্কিল গতিকে মেজবৌ প্রত্যক্ষ করেছে। স্বামীহারা। শ্বশুরবাড়িতে সন্তান সন্ততি নিয়ে দারিদ্র্যকে সঙ্গী করেই জীবন অতিবাহিত করে। দিনান্ত পরিশ্রম করে সেবা করে চলে সংসারের। কিন্তু দারিদ্র্যকে হাসিমুখে স্বীকার করেছে মেজোবৌ।

ক্ষুধানিবৃত্তিই যদি মূল কথা হয় তবে যে ধর্ম তা দিতে পারে না, যে সমাজ দিতে পারে না, তাকে তো অস্বীকার করতেই হয়। মেজবৌয়ের আপন সমাজধর্ম তাকে আলো বাতাস দিতে পারেনি, তাই মেজবৌ আপন সমাজকে অস্বীকার করেছে। মেজবৌ কি ভালোবেসে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছে? তা তো নয়। সে উপন্যাসে বলেছে, ''আমি তো মেমসায়েব হতে আসিনি ভাই, মানুষ হতে এসেছিলুম। আলো-বাতাস প্রাণের বড় অভাব আমাদের সমাজে, তাই খাঁচার পাখির মত শিকলি কেটে বেরিয়ে পড়েছিলুম। কিন্তু ভাল যে হয়নি তা বলব না। এখন যা শিখেছি তাতে যেখানেই থাকি দুটো পেটের ভাত যোগাড় করবার অসুবিধা হবে না।''

এখানে মেজবৌ চরিত্রের দুটো দিক ফুটে উঠেছে—মুক্তি ও আত্মপ্রতিষ্ঠা। সব রকমের শৃঙ্খলমুক্তির কথা নজরুলের সাহিত্যকর্মে বারবার ফুটে উঠেছে। 'কাজী নজরুল ইসলাম: বিপ্লববাদ থেকে সাম্যবাদ' প্রবন্ধে কল্পতরু সেনগুপ্ত লিখেছেন—''নজরুল ইসলাম জেনেছিলেন এতকালের ধর্মীয় বা বুর্জোয়া ভণ্ডামির বেড়াজাল ভেঙে সত্যিই নারীমুক্তি সম্ভব হয়েছে শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্বে—সোভিয়েত ইউনিয়নে। সমাজতন্ত্রের অর্থ হচ্ছে নারীর পূর্ণ সমানাধিকার। এই সমানাধিকার যাতে আনুষ্ঠানিক না হয়ে বাস্তব হয় তার জন্য রুশবিপ্লবের সঙ্গে সেরূপ আইনকানুন তৈরি হয়েছিল নারী যাতে উৎপাদন, দেশশাসন, সাংস্কৃতিক ও সমাজকল্যাণের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে সেজন্য মাতৃত্বকে সাহায্য করার জন্য সর্ববিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল।''[৩৩]

খ্রিস্টধর্ম মেজবৌকে আপাত আত্মপ্রতিষ্ঠা দিলেও, সেই ধর্মের সঙ্গে সে নিজের ভাগ্যকে গেঁথে দেয়নি। পাদ্রীদের ধর্ম মেজবৌ-এর কাছে আপাত সাহারা হলেও, তাও যে একটা 'বন্ধন' নজরুল তাও 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে দেখিয়েছেন। মেজবৌ-এর ছেলে গুরুতর টাইফয়েড রোগে

আক্রান্ত। শাশুড়িও মৃত্যুশয্যায়—''সে দিন রাত্রেই মেজ বৌ, প্যাকালে, কুর্শি কৃষ্ণনগর যাত্রা করল। যাবার আদেশ পেতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। কিন্তু স্থানীয় মিশনারি কর্তারা মেজবৌকে ভাল করেই চিনতেন। কাজেই তারা আপত্তি করলেও যাওয়া বন্ধ করতে সাহস করলেন না।''[৩৮]

স্বার্থপর, ভেদবুদ্ধি সম্পন্ন, সংকীর্ণ সমাজকেও মেজবৌ প্রত্যক্ষ করেছে। সমাজ শুধু ধর্মীয় বন্ধনের বেড়ি পরিয়ে রাখে, যূথবদ্ধতায় বিশ্বাস করে না, পারস্পরিক সহানুভূতি সমাজ দেখতে জানে না—''কপালে এত দুঃখ লিখেছিলে আল্লা। মেজবৌ যাবার সময়ও ঘরের পয়সায় দুটো আঙুর কি একটা বেদানা কিনে দিতে পারলুম না। শুকিয়ে মরলেও কেউ শুধোয় না এসে। ঝেঁটা মার নিজের জাতের মুখে, গেঁয়াত কুটুমের মুখে।''[৩৯]

মেজবৌ চরিত্রে বিবর্তন রেখাটি স্পষ্ট। যে পরিবার তাকে বেঁধে রেখেছিল ধর্মের বিধান আর দারিদ্র্য দিয়ে তাকে সে ছিন্ন করেছে, যে ধর্ম তাকে আলো বাতাস দেয়নি, মানবতার শিক্ষা দেয়নি যে সমাজ যূথবদ্ধতা শেখায়নি তাদেরকে সে অস্বীকার করেছে, ছিন্ন করে বেরিয়ে এসেছে। তারপর নিজেকে সর্বজনীন অস্তিত্বে প্রতিষ্ঠা করেছে। সকল খোকার চোখে দেখেছে আপন খোকাকে। ''আজ পাড়ার সব ছেলেই আমার খোকা।''[৪০] অথবা ''ঐ সব শিশুদের খাওয়াতে খাওয়াতে তাদের প্রত্যেককে আদর করে কোলে করতে করতে তার মনে হচ্ছিল তার খোকা হারায়নি।''[৪১]

মেজবৌ প্রকৃত মানবধর্মকে খুঁজে পেয়েছে। সে বলেছে—''আমি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের একটু করে পড়াব বলে মনে করেছি।'' অর্থাৎ যা ছিল পারিবারিক সংকীর্ণ সমাজবিধির অধীন অথবা সংকীর্ণ ধর্মীয় আবরণে ঢাকা—তা দেখা দিল সর্বজনীন রূপে। এই বিবর্তনে মার্কসীয় চেতনার বিস্তার লুকিয়ে আছে বলেই মনে করি। মেজ বৌ সম্পর্কে নজরুলও শেষ পর্বে বলেছেন, ''মেজবৌর চোখে তখন বিশ্বমাতার পরিপূর্ণ দীপ্তি।''[৪২]। পাভেলের 'মা' না হোক, ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে এরকম 'মা' বাংলাদেশ তো চাইছিল, নজরুল তার চাহিদা মিটিয়েছেন।

**উল্লেখপঞ্জি**


১. বসু, অরুণকুমার, *নজরুল জীবনী*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ১
২. আহমদ, মুজফ্ফর, *নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১৮
৩. বসু, অরুণকুমার, *নজরুল জীবনী*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ১৮
৪. তদেব, পৃ. ২৩
৫. ঘোষ, অরুণাভ (স.), *রাজনীতির নজরুল*, প্রগ্রেসিভ, কোলকাতা, পৃ. ১৪১, প্রবন্ধ : 'ভারতের

কমিউনিস্ট আন্দোলন ও কাজী নজরুল ইসলাম', প্রবন্ধকার : অমিতাভ চন্দ্র

৬. আহমদ, মুজফ্‌ফর, *নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১০৮
৭. চন্দ্র, অমিতাভ, 'ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন ও কাজী নজরুল ইসলাম', *রাজনীতির নজরুল*, অরুণাভ ঘোষ (স.), প্রগ্রেসিভ, কোলকাতা, পৃ. ১৪১, পৃ. ১৪৭
৮. আহমদ, মুজফ্‌ফর, *নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, পৃ. ৩৭
৯. তদেব, পৃ. ১১০
১০. তদেব, পৃ. ৩৫
১১. তদেব, পৃ. ৩৫
১২. তদেব, পৃ. ১৫৪
১৩. দাশ, সুস্নাত, 'সাংবাদিক নজরুল', গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা শাখা ২০০১, *পলিমাটি*, পৃ. ৭৬
১৪. তদেব, পৃ. ৭৭
১৫. সেনগুপ্ত, বাঁধন, 'নজরুলের রাজনৈতিক চিন্তা : একটি ভিন্নধর্মী সমীক্ষা', *রাজনীতির নজরুল*, সম্পাদনা : অন্নদাশঙ্কর রায় ও অরুণাভ ঘোষ, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কোলকাতা, ২০০১, পৃ. ৩৮
১৬. বসু, অরুণকুমার, *নজরুল জীবনী*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ১৭০
১৭. রায়, মোহিত, 'কৃষ্ণনগর থেকে নজরুল লিখিত পত্রাবলী', *একবিংশতি*, অচিন্ত্য বিশ্বাস, কোলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৩২
১৮. ভট্টাচার্য, বিশ্ববন্ধু, 'বাংলা উপন্যাসে কমিউনিস্ট চরিত্র', *বাংলার সংস্কৃতিতে মার্কসীয় চেতনার ধারা*, সম্পাদনা ধনঞ্জয় দাস, *অনুষ্টুপ*, কোলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ১১৪
১৯. *নজরুল উপন্যাস সমগ্র*, রূপায়ণী প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৪১
২০. 'নন্দন' পত্রিকা, জানুয়ারি ১৯৯৯, সম্পাদক বিপ্লব দাশগুপ্ত, কোলকাতা, পৃ. ৪৮
২১. ভট্টাচার্য, বিশ্ববন্ধু (স.), *নজরুল শতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য*, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষক সমিতি, নেতাজি ইনস্টিটিউট ফর এশিয়ান স্টাডিজ, কোলকাতা, পৃ. ১৫৫
২২. *নজরুল উপন্যাস সমগ্র*, রূপায়ণী প্রকাশনী, কলকাতা, ২য় সং ২০০১, পৃ. ১৪২
২৩. চন্দ্র, অমিতাভ, 'ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন ও কাজী নজরুল ইসলাম', পৃ. ১৬২
২৪. অমিতাভ, চন্দ্র, 'ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন ও কাজী নজরুল ইসলাম', *রাজনীতির নজরুল*, অমিতাভ, চন্দ্র (স.), প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কোলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৬৩
২৫. *নজরুল উপন্যাস সমগ্র*, রূপায়ণী প্রকাশনী, কলকাতা-৭৩, ২য় সং ২০০১, পৃ. ১৪১
২৬. তদেব
২৭. তদেব, পৃ. ১৫০
২৮. তদেব, পৃ. ১৫৫
২৯. তদেব, পৃ. ১৫৬
৩০. তদেব, পৃ. ১৫৭
৩১. তদেব
৩২. তদেব

৩৩. তদেব, পৃ. ১৭৬
৩৪. তদেব, পৃ. ১৮১
৩৫. দাশগুপ্ত, বিপ্লব (স.), 'নন্দন', জানুয়ারি, ১৯৯০, কলকাতা, পৃ. ৫৩
৩৬. *নজরুল উপন্যাস সমগ্র,* রূপায়ণী প্রকাশনী, কলকাতা-৭৩, ২য় সং ২০০১, পৃ. ১৬৭
৩৭. দাশগুপ্ত, বিপ্লব (স.), 'নন্দন', জানুয়ারি, ১৯৯০, কলকাতা, পৃ. ৫৩
৩৮. *নজরুল উপন্যাস সমগ্র,* রূপায়ণী প্রকাশনী, কলকাতা-৭৩, ২য় সং ২০০১, পৃ. ১৬৯
৩৯. তদেব, পৃ. ১৬১
৪০. তদেব, পৃ. ১৭৩
৪১. তদেব
৪২. তদেব, পৃ. ১৭৪